পথরেখা

সংবিধান সংশোধনের কিছু খোলামেলা প্রস্তাব

– ড. হাসনান আহমেদ

সংবিধান পরিবর্তন মৌসুম চলছে। বিস্তারিত লেখা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কয়েকটা দফা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

১. **মূলনীতির পরিবর্তন:** সংবিধানের মূলনীতিতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিস্থাপিত করে সাথে দুটো মূলনীতিকে যোগ করা যায়– ধর্ম-সম্প্রদায় অহিংসতা এবং গণতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম না-বোধক শব্দ, পরিহার করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিক, সব ধর্মই সমান।

২. **সরকার ও রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন:** সরকার কাঠামোতে ক্ষমতাসীন সরকারি দল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এ সুযোগটাই রাজনৈতিক দল নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলই এদেশে সব অন্যায়ের সুতিকাগার। এরা সমাজ ও সমাজের মানুষকে মানব-আপদ করে তুলছে। এজন্য বিধান পরিবর্তন করে সব রাজনৈতিক দলকে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার মধ্যে আনতে হবে। কারণ যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। প্রতিটা দলে ভালো স্বভাবের লোকের তুলনায় খারাপ প্রকৃতির নেতা-কর্মীর সংখ্যা অত্যধিক। এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকবে বটে কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট দলের সদস্যপদ নিতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দলীয় নেতা-কর্মীদের তালিকা জমা দিতে হবে। যে কোনো কর্মী বা নেতার দুর্নীতি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট দলকে রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। আমরা এদেশের রাষ্ট্রপতি পদটাকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছি। সেজন্য রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে।

৩. **এমপিদের দায়িত্ব বণ্টণ ও কর্মপরিধি:** বাস্তবতা বলে, দেশের যত অপকর্মের হোতা, চোরাকারবারি, দুর্নীতিবাজ, টাকার বিনিময়ে সংসদের দলীয় সদস্যপদ কেনা-বেচা, এমপি নির্বাচিত এলাকার মধ্যমণি হয়ে সব সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করা, উপায়-রোজগার করা, এলাকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করা, এলাকার বিভিন্ন পক্ষ ও সমিতি ইত্যাদি থেকে অবৈধ টাকা রোজগার করার ফাঁদ তারা তৈরি করেন। এমপি হয় টাকার জোরে এবং আরো টাকা তৈরি করার জন্য। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় অর্থের বণ্টন ও উন্নয়ন কাজে অর্থের লেনদেন এবং অর্থ ও অনুদান সংশ্লিষ্ট ভাগবাঁটোয়ারার কোনো বিষয় ও ক্ষমতা থেকে সংশ্লিষ্ট এমপিকে দূরে রাখার বিধান থাকবে। ফলে এমপি হওয়াটা কোনো লাভজনক পেশা হবে না। তারা সংসদে আইন প্রণয়ন, দেশের উন্নয়ন ও সমাজসেবার বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। এতে টাকার অভাবে ও দুর্নীতি করেন-না বলে যারা এমপি হতে পারেন না অথচ সুশিক্ষিত, নীতিবান ও সমাজসেবা করতে ইচ্ছুক– তারা রাজনীতিতে আসবেন। বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যই অধিকাংশ নেতাকর্মী রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়। বর্তমান রাজনীতি হয়ে গেছে যত দুর্নীতিবাজ ও সোশ্যাল টাউটদের রাজনীতির নামে মিথ্যাচার ও লাঠি-পুঁজির ব্যবসা।

৪. **রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার:** দেখলাম মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারও একনায়কতন্ত্রের নামান্তর। তাই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও জনপ্রতিনিধি (এমপি) নির্বাচন করবে। এ পদ্ধতিতে সমাজের কালা জাহাঙ্গীর, মুরগি মিলন গং যেমন এমপি হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, আবার এমপি আনার গংও এমপি হতে পারবে না। ক্ষমতাসীন দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড জনস্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী হচ্ছে কিনা রাষ্ট্র তা তদারকি করবে। রাষ্ট্রীয় প্রধান যদি একজন হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের অনুগত কাউকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রপতি বানিয়ে ফেলেন। তিনি দলীয় কল্যাণ বেশি দেখেন ও ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হন। এটা পদের জন্য মর্যাদাহানিকরও বটে। এজন্য রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অধিক উপযুক্ত।

৫. **দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা:** এদেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এত ছোট একটা দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চলে না। আবার এদেশে প্রদেশ করার একটা ঝুঁকি আছে। এতে দেশ বিভাজনের এবং কোনো অঞ্চল বেহাত হবার সম্ভাবনা বেশি। প্রতিটা বিভাগকে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

৬. **সুপ্রিম কাউন্সিল গঠন:** বিচারপতি অপসারণে 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' পুনর্বহালের রায় আমাকে আশান্বিত করেছে। 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' নাম থেকে 'জুডিশিয়াল' শব্দটা মুছে দিতে হবে। 'সুপ্রিম কাউন্সিল' গঠন করে এর কাজের আওতাকে অনেক বাড়াতে হবে। সুপ্রিম কাউন্সিল হবে একটি অরাজনৈতিক রাষ্ট্র- প্রতিনিধিত্বকারী তত্ত্বাবধান বডি এবং রাজনীতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে হবে সরকার। সরকার হবে দলীয়, রাষ্ট্র হবে নির্দলীয়। কাউন্সিলের সদস্যরা নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। বিভিন্ন অরাজনৈতিক পেশাদার সংগঠনের মধ্য থেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ দুই লাখ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলিতে ভারসাম্য আনতে হবে। কাউন্সিল 'ব্লাড হাউন্ড' না হয়ে 'ওয়াচ ডগ'-এর দায়িত্ব পালন করবে। কাউন্সিলরের সংখ্যা ১৫ থেকে ২১ জন হতে পারে। সংবিধানে তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর সীমানা নির্ধারিত থাকবে। সরকারের মেয়াদ ৫ বছর হওয়ায় কাউন্সিলের মেয়াদ ৬ বছর হবে।

বিচার বিভাগসহ সরকারের নির্বাহী ও আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রণের অনেক কাজও ভারসাম্যপূর্ণভাবে 'সুপ্রিম কাউন্সিল'-এর হাতে থাকবে। সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, রাজনৈতিক সরকার ও বিরোধীদলের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণও এ কাউন্সিল করবে। সরকারি ও অন্য রাজনৈতিক দলের অসৎ কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এক-ব্যক্তিভিত্তিক দলীয় ব্যক্তিকে সাক্ষিগোপাল হয়ে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কাউন্সিলরদের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকবে। তারা হবেন দেশবরেণ্য এবং শ্রদ্ধেয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। নির্বাচন কমিশন 'সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচন' পরিচালনা করবে।

প্রধান সুপ্রিম কাউন্সিলর একা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ২/৩ কাউন্সিলরের সম্মতির এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের সম্মতি নিতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সুপ্রিম কাউন্সিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজন বোধ করলে নির্বাচন চলাকালীন এক বা একাধিক অরাজনৈতিক যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে তিন মাসের জন্য নিয়োগ দিতে পারবে। এ পদ্ধতিতে গেলে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব আর দরকার হয় না। এক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত 'ন্যায়পাল'-এর বিধান না রেখে ন্যায়পালের কার্যাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকটা সুপ্রিম কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রয়োজন রাজনীতিতে স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংপ্রভ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। এ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তাদের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করবে। দেশপ্রেমী-সুশিক্ষিত, সুনীতির ধারকগণ দেশসেবার জন্য রাজনীতিতে আসবেন। কোনো একক পক্ষের অদূরদর্শীতা, বিদেশী শক্তির প্রতি দেশবিরোধী আনুগত্য ও দাসত্ব এবং গদি রক্ষা করতে গিয়ে এ দেশ যেন কোনোদিন 'দ্বিতীয় ফিলিস্তিনে' পরিণত না হয়। এখানেই আমার বড্ড ভয়।

৭. **রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন:** দেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে না। এদেশের কোনো নাগরিককে রাজনীতি করতে হলে সাধারণ সমাজে এসে রাজনীতি করতে হবে। নইলে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দৌরাত্ম্যে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু কাজকর্মের পরিবেশ যেমন নষ্ট হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। রাজনৈতিক আনুগত্যের মাধ্যমে পদ ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার উন্মুক্ত ব্যবসা চলছে। এখান থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত দেশের সুষ্ঠু পরিবেশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে অসম্ভব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি আইন করে বন্ধ করতে হবে। প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটা অরাজনৈতিক কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন থাকবে। তারা ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার, দেশের উন্নয়ন ও শিক্ষার

উন্নয়নের কথা বলবে। এছাড়া প্রতিটা ফ্যাকাল্টিতে ছাত্রছাত্রীদের কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার এ্যাকটিভিটির জন্য একাধিক ক্লাব বা ফোরাম থাকতে পারে। দলীয় লেজুড়বৃত্তি, রামদা-চাপাতির ট্রেইনিং, চাঁদা আদায় করে ধনী হওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রধান কাজ সময় দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণা করা। উপাচার্য নিয়োগও দলীয় ভিত্তিতে হবে না। নির্দলীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, যিনি শিক্ষার মান ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিতে পারবেন, এমন ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে।

৮. **স্থায়ী শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা:** শিক্ষার মানোন্নয়ন, পরিবেশের উন্নয়ন, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা বন্ধ ইত্যাদি করতে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এই জনবল দিয়েই তা সম্ভব। প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিক নির্দলীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবধর্মী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। এজন্য সাংবিধানিক আইনে একটা স্থায়ী 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' তৈরি করা, যার কার্যাবলি ও কর্মের আওতা সংবিধানেই লেখা থাকবে। এ কমিশন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে। অতি সংক্ষেপে বললে এর কাজ হবে: পুরো শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণ, কর্ম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন। প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর কাজের বিস্তৃতি হবে। এ কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক গড়তে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাইসাপেক্ষে বিদ্যমান শিক্ষকদের মধ্য থেকে অযোগ্য শিক্ষকদের বেছে স্বেচ্ছা অবসরেও পাঠাতে পারবে। ভালো শিক্ষক আনার জন্য প্রয়োজনে আলাদা পে-স্কেল দেওয়ার সুপারিশও করবে। মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চালু করবে; শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সকল কর্তৃপক্ষের কাজ নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং সমন্বয়সাধন করবে। শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন সমস্যার কারণে শিক্ষার মান নীচে নেমে গেছে। সার্বিক বিবেচনায় দশম শেণি পর্যন্ত 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি' এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা (জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা) চালুর কোনো বিকল্প নেই। এসব বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৯. **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:** স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রাম-গঞ্জে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সালিশ-দরবারসহ প্রতিটা বিষয়ে দলবাজি ও টাকার খেলা উন্মুক্তভাবে চলছে। স্থানীয় সরকারে দলভিত্তিক নির্বাচন হওয়াতে সমাজে বিভক্তি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। মুখ ও দল বিবেচনায় শালিস-দরবার হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যান-মেম্বররা শালিসের নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে খাচ্ছে। সমাজে দলীয় স্বজনপ্রীতি বেড়ে গেছে। সরকার থেকে গম, টাকা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি নামে যত আর্থিক সুবিধা যায়, নিজ-দলীয় লোকজনের মধ্যেই বন্টন হতে দেখা যায়। সমাজে সমতার নীতি বহাল রাখতে স্থানীয় সরকারে অরাজনৈতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে সব সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে রাজনীতি।

১০. **সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন:** এদেশে এমন কোনো সরকারি অফিস আছে কিনা আমার জানা নেই, যেখানে দুর্নীতির কাল-ব্যাধিমুক্ত। এজন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বিধিমালা পরিবর্তন করা ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ দরকার। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা নন, বরং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী এ হুঁশবোধ তাদের মধ্যে আইনের মাধ্যমে আনতে হবে।

১১. **ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন:** এদেশে ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন বিষয়টি বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। এজন্য আনুপাতিক হারে আসন বন্টনের ব্যবস্থা না করাই ভালো। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশপ্রেমী জনগণের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে; নইলে ভবিষ্যতে দেশ-বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মতো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে মাথায় বস্তা ও পোটলা নিয়ে জমির আল বেয়ে বাংলাদেশিদের একটা বৃহদংশ অন্য কোথাও অজানা গন্তব্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?

১২. অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে সংবিধান সংশোধন করবে। সরকারের মেয়াদ চার বছর না করে পাঁচ বছর রাখাই সমীচীন হবে। ঘন ঘন নির্বাচনে খরচ বাড়ে। নির্বাচিত সরকার উন্নয়নের কিছু কাজ করতে না করতেই মেয়াদ শেষ হবে।

(২৪ নভেম্বর ২০২৪ মানবজমিন পত্রিকার জনতার চোখ কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ; web:pathorekhahasnan.com